ইসলাম এবং গণতন্ত্রের বাস্তবতার বিষয়ে ২০০৭ সালে কৃত শাইখ আব্দুর রহীম গ্রীন (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) এর একটি অত্যন্ত উপকারী আলোচনা

ইসলাম এবং গণতন্ত্র

আলোচনায়: শাইখ আব্দুর রহীম গ্রীন (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন)

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

\- - - - - - - - - - - - - - - - - -

আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করছি।

আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য কামনা করি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করি নিজেদের মন্দ হতে এবং নিজেদের মন্দ কর্মের ক্ষতিকর ফলাফল হতে। যাকে আল্লাহ সঠিক পথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে সঠিক পথ দেখাতে পারে না।

এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, শুধুমাত্র আল্লাহই ইবাদতের যোগ্য ইলাহ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল।

অতঃপর শ্রেষ্ঠ বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথনির্দেশ।

আর কাজসমূহের মধ্যে নিকৃষ্ট হলো সেই কাজসমূহ যেগুলো দ্বীন ইসলামে নতুনভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে, আর দ্বীন ইসলামের মাঝে প্রত্যেক নব্য উদ্ভাবিত বিষয়ই হলো বিদআত বা নব উদ্ভাবন, আর এই সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ স্বভাবগতভাবেই আমাদেরকে বিচ্যুত করে সেই সরল পথ থেকে যেটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন। আর যে ব্যক্তি বিভ্রান্ত হয় এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়, সে পর্যায়ক্রমে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাবিত হয়।

নিঃসন্দেহে আমাদের আলোচ্য বিষয় “ইসলাম ও গণতন্ত্র” হচ্ছে এমন একটি বিষয় যেটি বর্তমান সময়ের জন্য অনেক বিতর্ক তৈরি করবে। তবে ইতিমধ্যেই আমি যা বলেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা অবশ্যই অন্ততঃপক্ষে মুসলমানদের জন্য কোনো বিতর্কিত বিষয় হওয়া উচিত নয়।

কারণ আমরা যদি অন্য কোনো সময়ে, অন্য কোনো যুগে চলে যেতে পারি, তাহলে আলোচ্য বিষয়টি কোনো উদ্বেগজনক বিষয় হবে না।

"গণতন্ত্র" মতবাদটি ইতিহাসের পাতায় শুধুমাত্র গ্রীসের একটি ছোট রাষ্ট্রেই খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে তারা এরকম একটা সরকার ব্যবস্থা পরিচালনা করতো যাকে ঐ সময়কার দার্শনিকরা অভিহিত করেছেন গণতন্ত্র হিসেবে।

আর এটা একটা খুব মজার বিষয় যে, তৎকালীন গ্রীক দার্শনিকরা গণতন্ত্রকে অভিহিত করতো একটি অমানানসই, দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার ব্যবস্থা হিসেবে! একজন প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক বলেছেন যে, গণতন্ত্রের একটি প্রধান সমস্যা হলো তৎকালীন গ্রীকদের সময়ে নেতারা সবসময় জনগণের খেয়াল-খুশির কাছে নতিস্বীকার করতো যাতে তাদের সমর্থন পেতে পারে, আর এভাবে একজন নেতা কখনোই অবিচল, সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হতো না। আর নীতিগতভাবে একজন নেতার যেরূপ বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত তা সে নিতে পারতো না। কারণ এরূপ করলে সেই নেতাকে জনমতের বিরুদ্ধে যেতে হবে, আর এভাবে সে জনসমর্থন হারাবে, এবং এর ফলে নেতা হিসেবে সে তার অবস্থান ধরে রাখতে সমর্থ হবে না।

এমনকি তখনও, সেই হাজার বছর পূর্বে গ্রীক দার্শনিকরা এই পদ্ধতির কিছু দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করে গেছেন।

আর সেই তুলনায় এটা হচ্ছে সাম্প্রতিক ইতিহাস যে, গণতন্ত্রের এই মতবাদটি আবারও উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হয়েছে, এবং অতঃপর সর্বপ্রথম ছড়িয়ে পড়েছে মূলতঃ ব্রিটেন এর দ্বারা, অথবা হতে পারে প্রথমত ফ্রান্স এবং এরপর ব্রিটেন ও আমেরিকার দ্বারা - মানব কর্তৃক শাসনের একটি আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে, একটি আদর্শ উপায় হিসেবে - যার মাধ্যমে মানুষ নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনা করে।

এখন, গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পটভূমিতে চলে যাওয়া এবং এর বেড়ে উঠার কারণসমূহ ইত্যাদি আমাদের আজকের বক্তৃতার বিষয়বস্তু না। আর যদিও আমাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকে, আমার হাতে এগুলো নিয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য নেই। এবং আমি প্রশ্নও করছি যে, এগুলোর খুব গভীরে গিয়ে কি কোনো উপকার আছে?

এখন, আমি জানি আজকাল পৃথিবীতে অনেক মহল আছে যারা তাদের সমালোচনার মাধ্যমে ইসলামকে এবং তাদের ভাষায় "ইসলামী মৌলবাদ" অথবা "ইসলামী কন্ঠ" কে আক্রমণ করছে, এবং (নিজেদের অজান্তেই) অতীতের মুসলমান শাসকদের মূল্যবান বক্তব্য ও উপদেশ এবং মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্যের গুরুত্বকে আলোকিত করে তুলছে।

আমি প্রথমত এর সাথে যোগ করবো যে, আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে যেন আমাদের নিজেদের মানুষজন এবং আমাদের সকল কার্যক্রম ও এজেন্ডাসমূহ অমুসলিমদের সাজানো প্রক্রিয়া অনুসারে গড়ে না উঠে।

আমার মনে আছে, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলী এবং আফগানিস্তানে আমেরিকার কুখ্যাত আগ্রাসনের পর আমি যুক্তরাজ্যে বেশ কিছু বক্তৃতা দিয়েছিলাম, এবং আমার বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল তালেবান, আফগানিস্তান ও ইসলামী মৌলবাদ। এবং সেখানে অমুসলিমদের থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। আমি আমার বক্তৃতায় এমন সংখ্যক অমুসলিমদের দেখেছিলাম যেটি আমি আগে কখনো দেখি নি।

আমি সেখানে মুসলমানদেরকে যে বার্তাগুলো দিতে চেয়েছিলাম তার মাঝে অন্যতম একটি হলো – যেহেতু আমি প্রশ্ন–উত্তর পর্বে দেখেছিলাম অনেক মুসলমানেরা দাঁড়িয়েছিল এবং তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে "মৌলবাদী মুসলমানদের" বিরুদ্ধে কথা বলছিল: "অমুক মৌলবাদী অমুক করেছে" এবং "অমুক মৌলবাদী তমুক করেছে" – আর আমি ঐ মানুষদেরকে উপদেশ দিয়েছি যেমন এখন আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি,

সেই সব লোকদের এজেন্ডা এবং মিডিয়াকে সুযোগ করে দিবেন না যারা আমাদের দ্বীনকে বিশ্বাস করে না, এবং যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৌভাগ্যবান উম্মাহ এর অংশ নয়। তাদেরকে সুযোগ করে দিবেন না যাতে তারা আমাদেরকে আরো বিভক্ত করতে পারে! তারা আমাদেরকে বিভক্ত করতে চায় মৌলবাদী ও উদারপন্থী ও আধুনিক মুসলমান হিসেবে! কারণ তারা আমাদেরকে যত বেশী দলে বিভক্ত করতে পারবে, এবং এভাবে আমাদের নিজেদের মধ্যে যত বেশী দ্বন্দ্ব–লড়াই বাঁধিয়ে দিতে পারবে, এবং আমাদেরকে আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই যত বেশী ব্যস্ত রাখতে পারবে, তারা তত বেশী খুশি হবে।

তাই আমি "মৌলবাদী মুসলমান", "ইসলামপন্থী মুসলমান" – এই শব্দগুলো মোটেও পছন্দ করি না। "মৌলবাদ" শব্দটির আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই মৌলবাদী হতে হবে। কারণ মৌলিক বা মূলগতভাবে আমরা সবাই ইসলামে বিশ্বাস করি।

আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে, কোরআন হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী। আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে, কোরআন অবিকৃত রয়েছে এবং অবিকৃত থাকবে যতদিন না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনকে তুলে নেন। আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ কোরআনের সাথে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যার সকল কথা সত্য, যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত, যার জীবন হচ্ছে কোরআনের ব্যবহারিক ব্যাখ্যা, আর এই ব্যবহারিক ব্যাখ্যা আজও আমাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। এবং আমরা একে সাধারণ পরিভাষায় বলে থাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ।

আমরা সবাই কোরআনে বিশ্বাস করি, এবং আমরা সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাহহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহতে বিশ্বাস করি। এবং যারা কোরআনের একটি আয়াতে অবিশ্বাস করে এবং যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাহহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদীস জানতে পেরেছে এবং তারা এটাও জেনেছে যে হাদীসটি সহীহ এবং তারা তা অবিশ্বাস করেছে, তাহলে তারা পুরো দ্বীনকেই অবিশ্বাস করেছে।

এটাই প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করে। এটা আমাদের দ্বীনের মৌলিক বা মূল ভিত্তি।

সুতরাং, আজকের আলোচনার সূচনায় এসেছে আমাদের দ্বীনের মৌলিক বা মৌল বিষয়াদি, কোরআন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ, এবং এর সাথে আরও যা সংযোজন করতে হবে তা হচ্ছে, সেই সকল মানুষেরাই (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এই দ্বীনকে সবচাইতে উত্তমরূপে বুঝেছিলেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং তাঁর কথা শুনেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন তাঁর সাহাবীগণ; সাহাবীরা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন্ত ছাত্র।

যখন নবীজি নামাজ পড়েছিলেন, তাঁরা সরাসরি তা দেখেছিলেন, তাঁরা দেখেছিলেন যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উটের উপরে বসেছিলেন এবং নবীজির উপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল, আর তা এত ভারী ছিল যে, নবীজি ঘামতে শুরু করেছিলেন, এমনকি নবীজি যে উটের উপর বসেছিলেন তা ঝুঁকে গিয়েছিল এবং ওহীর ভারে বসে পড়তে বাধ্য হয়েছিল! তাঁর সাহাবীগণ এটা দেখেছিলেন। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জীবন যাপন করেছিলেন।

অতএব এটাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার এবং এটা কোরআনের আয়াত দ্বারা সমর্থিত যে, তাঁদের বুঝ ও উপলব্ধিই হলো শ্রেষ্ঠ বুঝ ও উপলব্ধি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর কিতাবে বলেন, যার অর্থ এমন:

যদি কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঈমানদারদের রাস্তা পরিত্যাগ করে অপর কোনো রাস্তায় চলা শুরু করে, তবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পছন্দকৃত রাস্তায় পরিত্যাগ করবেন এবং পরবর্তীতে তাদেরকে জাহান্নামে আবাস দান করবেন, যা কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল! **(১)**

এবং একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন সাহাবীদের হৃদয় কম্পিত হলো এবং তাঁরা কাঁদতে শুরু করেন। এবং তাঁরা এমন অনুভব করছিলেন যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বিদায় জানাচ্ছেন, যেন এটাই ছিল তাঁর বিদায়ী ভাষণ। সুতরাং তাঁদের একজন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যেন এটা আপনার বিদায়ী ভাষণ। সুতরাং আমাদেরকে নসীহত করুন।"

তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে কিছু মূল্যবান উপদেশ আশা করছিলেন যাতে তিনি যদি ঐ মুহূর্তে বিদায় নেন, তাহলে কিছু একটা থাকবে যা তাঁরা আঁকড়ে ধরে রাখবেন। আর সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলা শুরু করলেন,

তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো,"

"আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের আমীরের কথা শুনো এবং মান্য করো যদিও সে হয় একজন আবিসিনিয়ান দাস।"**(২)**

তিনি আরও বললেন, "আমার পরে তোমরা অনেক মতপার্থক্য দেখবে, তোমরা অনেক ইখতিলাফ দেখবে।"

নবীজি তাঁর সাহাবীদেরকে বলছিলেন যে, আমি বিদায় নেবার পর তোমরা দেখবে যে, মানুষেরা অনেক মতভেদ করছে।

সুতরাং তিনি বললেন, "তোমরা আমার সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের (সঠিকভাবে পরিচালিত উত্তরসুরিদের) সুন্নাহ আঁকড়ে ধরো।"

"আর তোমাদের মাড়ির দাঁত দিয়ে একে কামড়ে ধরো এবং দ্বীনে নব-উদ্ভাবিত বিষয় সম্পর্কে সাবধান হও!"**(৩)**

এটা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপদেশ। তিনি কেবল নিজের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেন নি, বরং তিনি আরো বলেছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে, সঠিকভাবে পরিচালিত উত্তরসুরিদের সুন্নাহ।

এদের মধ্যে আছেন অবশ্যই প্রথমত আবু বকর সিদ্দীক, এরপর উমর ইবনে খাত্তাব এবং উসমান ইবনে আফফান এবং আলী ইবনে তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুম। সর্বপ্রথম এই খুলাফায়ে রাশেদীন এবং অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার, যার মধ্যে আছে তাঁর স্ত্রী আয়েশা এবং ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং তারা সবাই - যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এবং এরপর ন্যায়নিষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে যারা আলেম, উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা এবং আরো অনেক সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

এরাই তাঁরা যাদের দৃষ্টান্তকে নবীজি আঁকড়ে ধরে রাখতে বলেছিলেন। যখনই আমরা মতপার্থক্য দেখবো, আমাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে। আমাদের খেয়াল-খুশির কাছে নয়, আমাদের মতামত, আমাদের কামনা অথবা আমাদের বুদ্ধিমত্তার কাছে নয়। বরং, যখনই কোনো বিষয়ে আমাদের মতভেদ হবে, আমাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে।

সুতরাং ইসলামের মৌলিক কথা, ইসলামের একটি মৌল বৈশিষ্ট্য হলো আনুগত্য, আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ, আল্লাহ ও তাঁর আদেশের প্রতি বাধ্য থাকা। এটাই হচ্ছে ইসলামের অর্থের একটি মৌল পরিচয়। এজন্যই সবসময় মুমিনদের কথা একটাই, "আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।"

সুতরাং এটাই হচ্ছে ইসলাম – আল্লাহ ও আল্লাহর আদেশের প্রতি আত্মসমর্পণ, আর আল্লাহর আদেশ নিয়েই গঠিত তাঁর শরীয়ত।

আল্লাহ আমাদের যেসব আইন, আদেশ এবং নিষেধ দিয়েছেন সেগুলো সব নিয়েই শরীয়ত; হোক সেটা নামায পড়ার আদেশ ও নামায কিভাবে পড়তে হয় সেই বিধান, যাকাত দেবার আদেশ ও যাকাত কিভাবে দিতে হয় সেই বিধান, রোজা রাখার নির্দেশ ও রোজা কিভাবে রাখতে হয় সেই বিধান, হজ্জ করবার আদেশ ও হজ্জ কিভাবে করতে হয় সেই বিধান; সকল বিশ্বাসসমূহ যা আমাদেরকে ধারণ করতে হবে আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, নবী-রাসূলগণ আলাইহিমিস সালাম,

কিতাবসমূহ, তাকদীর এবং মৃত্যুর পরের জীবনের ব্যাপারে; সকল আইন-কানুন যেগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে মেনে চলতে হবে, কোনটা হালাল এবং কোনটা হারাম – এটাই শরীয়ত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আইনসমূহ। তালাক সংক্রান্ত আইন, পারিবারিক আইন, অপরাধ সম্পর্কিত আইন, আন্তর্জাতিক আইন – এভাবে সকল আইনসমূহ নিয়েই শরীয়ত গঠিত।

সুতরাং ইসলাম আমাদেরকে যে শিক্ষা দেয় তার মূল এবং সারমর্ম হলো, আমাদের নিজেদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হবে আল্লাহর আইনের কাছে। একজন মুসলমান বলতে এমন আত্মসমর্পণকারীকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

ইসলামের শিক্ষার সারমর্ম হলো, যদি কোনো মুসলমানকে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হয় যেখানে অন্য কোনো লোক তাকে এমন আদেশ দিয়েছে যা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি যে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করবে। একজন মুসলমান বলতে যা বোঝায় এটাই হলো তার সারমর্ম – আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ।

আমরা আমাদের পিতামাতা, আমাদের শিক্ষকমন্ডলী, আমাদের স্ত্রীগণ, আমাদের ছেলেমেয়ে, আমাদের কামনা-বাসনা, আমাদের শাসকবর্গ – বা অন্য যেই হোক না কেন; আমরা এদের সবার পূর্বে আল্লাহর আদেশকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করি।

মুসলমান হওয়া মানে হলো আল্লাহ সবার আগে। আর যদি আমরা আমাদের হৃদয় এবং আমাদের অন্তর দিয়ে কাউকে আল্লাহর সমান বলে গণ্য করি, তাহলে সেটা হয়ে যাবে শিরক। এটা একটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

এটা এমন একটা অপরাধ যার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন যে, তিনি যেকোনো গুনাহ নিজ ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমা করবেন, কিন্তু তিনি ক্ষমা করবেন না শিরক অর্থাৎ কাউকে তাঁর প্রতিপক্ষ, অংশীদার ও সমকক্ষ স্থির করা।

যে কেউই আল্লাহর সাথে শিরক করবে, যে কেউই আল্লাহর সাথে প্রতিপক্ষ, অংশীদার ও সমকক্ষ বানিয়ে নেবে, যে কেউই বিশ্বজগতের কোনো কিছুকে আল্লাহর সমপর্যায়ের মনে করবে, তাহলে অবশ্যই জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের আগুন হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান। কোরআন আমাদেরকে এই কথারই শিক্ষা দেয়।**(৪)**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন যার প্রতি আমাদের তীক্ষ্ণ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিছু লোকদের সম্পর্কে বলেন, যারা আমাদের পূর্বে এসেছিল এবং এখনো রয়েছে, তারা হলো ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা - যারা তাদের আলেম ও ধর্মযাজকদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে।**(৫)**

সেখানে একজন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন যিনি আগে খ্রীষ্টান ছিলেন। তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো তাদের উপাসনা করতাম না!" তিনি আগে খ্রীষ্টান ছিলেন, এবং তিনি মনে করছিলেন যে, খ্রীষ্টানরা তো তাদের আলেম ও ধর্মযাজকদের উদ্দেশ্যে সিজদা করতো না!

তারা তো তাদের সামনে কাকুতি-মিনতি করতো না এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করতো না এবং তাদের উপাসনা করতো না!

কিন্তু নবীজি এরপর এই আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করে দিলেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তারা কি তোমাদের জন্য তা হালাল করে নি যা আল্লাহ হারাম করেছেন? আর তোমরা তা মেনে নিয়েছো।"

"আর তারা কি তোমাদের জন্য তা হারাম করেনি যা আল্লাহ হালাল করেছেন? এবং তোমরা তা মেনে নিয়েছো।"

"আবার, তারা কি তোমাদের জন্য সেসব জিনিস বৈধ করে নি যেগুলোকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন?"

"এবং তারা কি তোমাদের জন্য সেসব জিনিস নিষিদ্ধ করেনি যেগুলোকে আল্লাহ বৈধ করেছেন?"

সাহাবী বললেন, "হ্যাঁ। আমরা তো এগুলো করতাম।"

এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এটা ছিল তাদের প্রতি তোমাদের ইবাদত।"**(৬)**

সুতরাং নিঃসন্দেহে, যে কেউই আল্লাহর পাশাপাশি কাউকে আইন প্রণেতা হিসেবে মেনে নিবে, স্বীকার করে নিবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে তাদেরও আইন প্রণয়ন করার অধিকার আছে, তাহলে সে আল্লাহর সাথে তাদেরকে অংশীদার বানিয়ে নিলো। যে কেউই এটা বিশ্বাস করবে যে, কোনো ইমাম, কোনো মুফতি, কোনো মাওলানা, কোনো শাইখ অথবা কোনো মানুষ আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার অধিকার রাখে, অথবা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করার অধিকার রাখে, তাহলে তারা ঠিক সেটাই করলো যেটা ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা করেছিল। তাহলে আপনি তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করেছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে একটা প্রতিমা হিসেবে উপাসনা করছেন।

আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আমার ভাই ও বোনেরা, যা ইমাম আবু হানিফা তার অনুসারীদেরকে বলেছিলেন এবং যা ইমাম শাফেঈ তার ছাত্রদেরকে বলেছিলেন, এবং যা ইমাম মালিক তার ছাত্রদেরকে বলেছিলেন এবং যা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তার ছাত্রদেরকে বলেছিলেন, এই সকল মহান ইমামগণ বলেছিলেন, "আমাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করো না। আমি যেখান থেকে গ্রহণ করেছি, তোমরাও সেখান থেকে গ্রহণ করো; কোরআন এবং সুন্নাহ।"

"যদি তুমি দেখো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কোনো কথা, কোনো হাদীস অথবা আয়াত আমার কথার বিপরীতে যায়, তবে আমার কথাকে প্রত্যাখান করো এবং আল্লাহর শিক্ষাকে গ্রহণ করো।"

তাঁদের কাউকে এমন কোনো আসনে অধিষ্ঠিত করা যাবে না যেখানে আপনি মনে করবেন যে, তাঁদের কথা যেকোনো প্রশ্নের উর্ধ্বে, অথবা তাঁদের উক্তি গ্রহণের জন্য কোনো চিন্তা-ভাবনা ও

জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এটা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বলেছেন তার সাথে মিলে? এই বিবেচনাটি থাকতে হবে।

আমি একজন মানুষ। ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহিমাহুমুল্লাহ - তাঁরাও মানুষ ছিলেন। আমরা সবাই ভুল করি। আমরা ভুলে যাই, আমাদের অনেক ত্রুটি হয়, আমরা মুখ ফসকে ভুল করে ফেলি। সুতরাং যেকোনো সিদ্ধান্তের জন্য আমাদেরকে সবসময় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যেতে হবে।

আমি এটা বলছি না যে, আপনারা কেবল কোরআন ও হাদীস এর বই খুলবেন এবং ফতোয়া দেয়া শুরু করবেন। না! আমাদের অবশ্যই সবসময় আলেমদের প্রয়োজন আছে। এবং আমাদের অবশ্যই আলেমদের কথাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা আলেম নই। আমি একজন আলেম নই। আমি ইমাম আবু হানিফা অথবা ইমাম শাফেঈ অথবা ইমাম মালিকের মতো কোনো আলেম নই। আমি একজন মুফতি নই যে, ইজতিহাদ করতে পারবো। কিন্তু আমরা দেখতে পারি উলামাগণ কি বলেছেন এবং সেই কথাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা এবং অন্যান্য উলামাদের কথার সাথে তুলনা করতে পারি।

ভাইয়েরা এবং বোনেরা, এই ব্যাপারে চিন্তা করুন। এই ব্যাপারে চিন্তা করুন।

আজকাল যে বাইবেল আমাদের কাছে আছে, সেটা কি সেই তাওরাত যা আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম কে দিয়েছিলেন, এবং সেই ইনজীল যা আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালাম কে দিয়েছিলেন, সেই যাবুর যা আল্লাহ দাঊদ আলাইহিস সালাম কে দিয়েছিলেন? – এই বাইবেল কি সেই একই? হ্যাঁ অথবা না?

না। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ।

সুতরাং, এটা কি সত্য নয় যে, এই বইগুলো পরিবর্তিত হয়েছে এবং বিকৃত হয়েছে এবং এগুলোর থেকে কিছু নেয়া হয়েছে এবং বাইরের কিছু এখানে প্রবেশ করানো হয়েছে? এই বইগুলোর ব্যাপারে এটা কি সত্য নয়?

হ্যাঁ, সত্য। এখন বিশ্বাস করুন, যদি কারো নিজেদের ইমামদের এবং নিজেদের আলেমদের এবং নিজেদের ধর্মযাজকদের অন্ধভাবে অনুসরণ করার কোনো অজুহাত থাকতো, তাহলে সেটা হতো ইহুদী এবং খ্রীষ্টানরা। তারা বলতে পারতো, "দেখুন আমাদের ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে গেছে। আমরা কিভাবে এমন গ্রন্থ বুঝতে পারবো যেটি বিকৃত হয়ে গেছে?"

"সুতরাং আমরা আমাদের আলেম এবং ধর্মযাজকদের অন্ধ অনুসরণ করবো, কারণ আমাদের ধর্মগ্রন্থ বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

সুতরাং, যদি কেউ অজুহাত খুঁজতে চায় তাহলে সে তা খুঁজে নিবে, কিন্তু আল্লাহ কি তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন? না। বরং আল্লাহ বলেছেন যে, তারা তাদের আলেম ও ধর্মযাজকদেরকে

আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে। নবীজি যার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এর মানে হলো আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করে নেয়া।

আমাদের একটা কিতাব আছে যাকে আল্লাহ সকল বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছেন। আমাদের আছে সুন্নাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহীহ হাদীস। আমাদের কি কোনো অজুহাত আছে যখন আমাদের কিতাব সংরক্ষিত রয়েছে?

সুবহানাল্লাহ। তাহলে "গণতন্ত্র" বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি? তাহলে "গণতন্ত্র" বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি?

অবশ্যই এটি একটি বিতর্কিত বিষয়।

গণতন্ত্র কি? আসলে গণতন্ত্র কি? এটা একটা ভালো প্রশ্ন।

লক্ষ্য করুন, কেউ আসলে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে চায় না। তারা সবাই বলবে গণতন্ত্র ভালো, গণতন্ত্র সঠিক। গণতন্ত্র কি??

আসলে গণতন্ত্রের অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ আছে। তারা আসলে এর সংজ্ঞা দিতে চায় না। কারণ তারা জানে যে, তাদের দেয়া কোনো সংজ্ঞাই সেই সরকার ব্যবস্থাকে বর্ণনা করে না যাকে তারা গণতন্ত্র বলে থাকে, যেটি আজকাল প্রচলিত আছে!

আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন, এটি হলো এমন সরকারব্যবস্থা যেটি "জনগণের থেকে, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা।" এটি গণতন্ত্রের একটি বিখ্যাত সংজ্ঞা।

মূল গ্রীক ভাষায় "গণতন্ত্র" শব্দটির সঠিক অর্থ হলো "জনগণের শাসন।" এটাই প্রকৃত অর্থ।

যদি আমরা গণতন্ত্রের ধারণাটি ও এর পরম অর্থকে একসাথে তুলে দেখি, তাহলে এর আক্ষরিক অর্থ হবে: জনগণের শাসন, জনগণের জন্য শাসন, জনগণের দ্বারা শাসন।

এবং আমরা এখন এই অর্থেরই বাস্তবায়ন করছি।

আমরা এই ধারণাটির আরও গভীরে যেতে চাই না। আসুন আমরা এই অর্থটাই গ্রহণ করি এবং এর দ্বারাই যাচাই করে দেখি, কারণ অন্ততঃপক্ষে এখান থেকে আমরা শুরু করতে পারি।

এই "গণতন্ত্র" কি ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তাই কি? একটু আগেই আমি আপনাদের বলেছিলাম ইসলামের মূল কথা হলো আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ। ইসলাম অর্থ আল্লাহর শরীয়তকে মান্য করা, ইসলাম অর্থ আল্লাহর আইন মেনে চলা। ইসলাম অর্থ কোনটা হালাল তা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং কোনটা হারাম তা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এবং আল্লাহ যেটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে হালাল নির্ধারণ করেছেন, তা আজো হালাল এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা হালাল থাকবে। এবং আল্লাহ যেটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে হারাম নির্ধারণ করেছেন, তা আজো হারাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম থাকবে।

মুসলমান হিসেবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও সার্বজনিক জীবন আল্লাহর আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

অতঃপর আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে আছে "আশ শারিঈ" – আইন প্রণয়নকারী এবং তিনি হলেন "আল হাকীম" – সর্বজ্ঞানী এবং "আল হাকিম" – শ্রেষ্ঠ বিচারক।

সুতরাং আমরা যখন বিচার কার্য পরিচালনা করবো, তখন আমাদের বিচার করতে হবে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী।

যেমনটি আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, "আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারা কাফের।"**(৭)**

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারা ফাসেক।"**(৮)**

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারা জালেম।"**(৯)**

সুতরাং, আইনপ্রণয়ন ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী হিসেবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরে কিভাবে জনগণকেই আইনপ্রণয়ন ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করা সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে?

কারণ গণতন্ত্রের খুব মৌলিক ধাপ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, জনগণের অধিকার আছে কোনটা হালাল এবং কোনটা হারাম তা নির্ধারণ করার! জনগণের অধিকার আছে নির্ধারণ করার যে, আমাদের কি করা উচিত এবং আমাদের কি করা উচিত না!

সুতরাং গণতন্ত্রে মানুষকে আল্লাহর সমকক্ষ বানানো হয়েছে, এবং যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর সমকক্ষ বানায়, সে নিঃসন্দেহে শিরক করলো। এবং যে বিশ্বাস করে যে, মানুষের অধিকার আছে আল্লাহর আইনের বিপরীতে আইন প্রণয়ন করার, সে নিঃসন্দেহে কাফের। এবং যে বিশ্বাস করে যে, মানুষের তৈরি আইন আল্লাহর আইনের চেয়ে উত্তম, সে নিঃসন্দেহে কাফের। এবং যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর বিচার ও আইনের বিপরীতে বিচার ও আইন প্রণয়ন করা অনুমোদনযোগ্য, সে নিঃসন্দেহে কাফের।

কিন্তু যদি কিছু মুসলমান দুর্বলতা, ঈমানের ঘাটতি অথবা বিশেষ পরিবেশে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়, অথবা তাদের কামনা-বাসনা ও দুর্বলতার কারণে তাদের জীবনে (কুফর ও শিরক ব্যতীত) এমন কিছু করে বসে যা আল্লাহর শরীয়ত এর বিপরীত, তাহলে তা আপনাকে কাফেরে পরিণত করবে না। এটা গুনাহ (যা কুফর/শিরক নয়), কারণ আপনি আপনার অন্তরে গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ যা বিধান দিয়েছেন তাই শ্রেষ্ঠ। এবং আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর আইন মানতে হবে। আসুন আমরা একটি সহজ উদাহরণ দেখি,

যদি কোনো ব্যক্তি মদ পান করে তবে কি সেটা তাকে কাফেরে পরিণত করে? না, যদি কোনো ব্যক্তি মদ পান করে তা তাকে কাফেরে পরিণত করে না। সাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) এবং এর পরে সকল আলেমগণ (রঃ) এই ব্যাপারে একমত, কেবলমাত্র চরমপন্থী খাওয়ারিজ গোত্র ব্যতীত, যে খাওয়ারিজদের ব্যাপারে অনেক আলেমগণ বলেছেন যে তারা এমনিতেও মুসলমান না।

সুতরাং তাঁরা সবাই একমত যে, কোনো গুনাহ (যা কুফর/শিরক নয়) আপনাকে ইসলামের বাইরে নিয়ে যাবে না। সুতরাং আপনি যদি মদ পান করেন আপনি কাফের হয়ে যাবেন না। আপনি ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবেন না। হ্যাঁ, যতক্ষণ আপনি মদ পান করতে থাকবেন, আপনার ঈমান আপনার মাথার উপরে ভাসতে থাকবে। কিন্তু আপনি এর দ্বারা একজন মুসলমান বিবেচিত হওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন না।

এমনকি যিনা-ব্যভিচারের ব্যাপারটাও একই। এবং রাসূলের (সাঃ) যুগেও লোকেরা ব্যভিচার করেছিল। আর আপনারা হয়তো জানেন যে, একজন পুরুষ ও মহিলা নবীজির সময়ে ব্যভিচার করেছিল এবং তারা বলেছিল, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শাস্তি আমাদের উপর প্রয়োগ করুন।" এবং যখন লোকেরা এই মহিলাকে গালিগালাজ করা শুরু করেছিল, নবীজি তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন। কারণ তাঁর তাওবা এতই শক্তিশালী ছিল যে, তাঁর তাওবা সকল মদীনাবাসীদের ক্ষমা পাবার জন্য যথেষ্ট হতো! সুতরাং সে এই কাজের দ্বারা কাফেরে পরিণত হয় নি।

কিন্তু কেউ যদি বলে, "মদ পান করায় কোনো সমস্যা নেই, এটা হালাল।" তাহলে এই কথার ফলে সে কাফেরে পরিণত হবে। কারণ আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল বানিয়ে ফেলেছে।

যাই হোক, গণতন্ত্র বিষয়টিতে ফিরে যাই, নিঃসন্দেহে আমাদের মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবনে অবশ্যই আল্লাহর শরীয়ত কায়েম করতে হবে। কারণ শরীয়ত কেবল কিছু শাস্তির বিধান নয় যা আমরা কোরআনে খুঁজে পাই, যেমন চোরের হাত কেটে দেওয়া - এটি একটি হুদুদ এবং এরকম মাত্র চার-পাঁচটি হুদুদ আছে। শরীয়ত হলো সবকিছু - নামায, রোজা, ব্যক্তিগত জীবন – এ সবই শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং একে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

কিন্তু যদি ঈমানের দুর্বলতার কারণে অথবা পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে আমরা কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থ হই, কিন্তু সেই কুকর্মটি অন্তর দিয়ে গ্রহণ না করি, তাহলে তা আমাদেরকে কাফেরে পরিণত করবে না। এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং আবার ফিরে যাই এবং নিজেকে জিজ্ঞেস করি যে, যদি গণতন্ত্র মানে হয় জনগণের সার্বভৌমত্ব, যেখানে জনগণের অধিকার থাকে কোনটা হালাল এবং কোনটা হারাম তা নির্ধারণ করার, তাহলে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানের অধিকারী কোনো মুসলমানও তা মেনে নিতে পারে না। বিষয়টি বোঝানোর জন্য আমি আপনাদের একটি কৌতুক বলবো। এটা সত্য না, এটা কৌতুক।

একজন লোক ছিল। সে আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো থেকে হিজরত করে আফগানিস্তানে আসলো, তখন তালেবানরা ক্ষমতায় ছিল। তো সে সেখানে বসবাস করতে গেলো। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো ...... এটা কিন্তু কৌতুক, সত্য না;

তারা জিজ্ঞেস করলো, "তুমি স্বাধীনতা ও বীরত্বের ভূমি আমেরিকা ত্যাগ করেছো, সকল টাকা-পয়সা, সকল উল্লেখযোগ্য বস্তু, সবকিছু ছেড়ে দিয়েছো এবং আফগানিস্তানে বসবাস করতে এসেছো, কেন?"

সে বললো, “যখন আমি ছোট ছিলাম, সমকামিতা একটা অপরাধ ছিল, যখন আমি বেড়ে উঠলাম সমকামিতা বৈধ হলো, এমনকি সমকামিতাকে ঘৃণা করাকেও তারা অপরাধ বানালো, এবং এর নাম দিলো ‘সমকামিতা আতংক’। আমি ভীত ছিলাম যে, যদি আমি আমেরিকায় এরপরেও বসবাস করতাম, তবে তারা এটাকে ততদিনে বাধ্যতামূলক বানিয়ে ফেলবে।”

আর সত্যিই, যদি আমরা গণতন্ত্র বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে দেখি, তাহলে এটাই গণতন্ত্রের বাস্তবতা, যদি আপনি বলেন জনগণের সার্বভৌমত্ব আছে এবং জনগণ আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আমি এখানে একান্ত মৌলিক দর্শনগত দিক দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি। আমি জানি সকল দেশের সংবিধান আছে। আমি জানি গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধারণায় সংখ্যালঘুদের জন্য বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা পাওয়া যায় এবং এরকম আরো অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমি এ ব্যাপারে আলোচনা করছি না। আমি শুধুমাত্র অত্যন্ত মৌলিক বিষয় নিয়ে আলচনা করছি। কারণ গণতন্ত্রের মৌলিক বিশ্বাসমালা অনুসারে চলতে গেলে সকল মুসলমানদেরকে এমন সব গর্হিত অপরাধকে মেনে নিতে হবে ইসলাম যেগুলোর কঠোরভাবে সমালোচনা করে! আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি?

ইংল্যান্ডে কাউকে তার সমকামিতার জন্য সমালোচনা করা হচ্ছে একটি ফৌজদারী অপরাধ! সুতরাং এখন অপরাধকে ঘৃণা করাই একটা অপরাধ হয়ে গেছে। মুসলমান হিসেবে আমরা কি এটা গ্রহণ করতে পারি? আমরা কি বলতে পারি ইসলাম এটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

এখানে কেউ কি চিন্তাও করতে পারেন যে, এই ধরনের ভাবাদর্শ আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? আমার আশা, উত্তরটি না। যদি সে মুসলমান হয়, এমনকি যদি সে মুসলমান নাও হয়ে থাকে, যুক্তি অনুসারে উত্তরটি হবে “না”। সে বলবে, “আপনার ধর্ম এবং এই ভাবাদর্শ সঙ্গতিপূর্ণ না।”

সুতরাং অত্যন্ত মৌলিক দর্শনগত দিক থেকে আমাদের বলতে হবে, ইসলাম গণতন্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যদি আমরা গণতন্ত্র দ্বারা বুঝে থাকি যে, জনগণের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব আছে।

কিন্তু অবশ্যই গণতন্ত্র দ্বারা শুধুমাত্র এটাই বোঝাতে হবে বিষয়টি তা নয়। গণতন্ত্র সম্পর্কে জনগণের বিভিন্ন ধারণা আছে। গণতন্ত্র কি নিয়ে গঠিত এ ব্যাপারে জনগণের বিভিন্ন ধারণা আছে। কিন্তু আজ রাতে গণতন্ত্রের ঐ সমস্ত প্রকারের সম্ভাবনা ও রূপসমূহ এবং কিভাবে আমরা ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সামঞ্জস্য করতে পারি – এ নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য না। আমি মনে করি না যে, এটা আমাদের প্রয়োজন। কারণ আমি বিশ্বাস করি ইসলাম ইতিমধ্যে আমাদের জন্য সরকার ব্যবস্থার একটি ভালো পদ্ধতি দিয়েছে। এবং সরকার ব্যবস্থার সেই ভালো পদ্ধতিটি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দেখিয়ে গেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, যদি আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীর দিকে ফিরে তাকাই, আমরা কি দেখতে পাই? আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পাই, যে উপায়ে নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের সাথে আচরণ করেছিলেন, তা বর্তমান পৃথিবীর যে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজ অপেক্ষা অনেক সুন্দর, অনেক সঠিক এবং অনেক ন্যায়পরায়ণ।

আমাদের একটা ব্যবস্থা আছে যার নাম "শূরা", যার মানে পরামর্শ। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাথে তাঁদের সার্বজনীন বিষয়ে পরামর্শ করতেন। কিংবা কিছু সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন যারা কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রত্যেকের সাথে পরামর্শ করা হবে না কারণ প্রত্যেকে প্রত্যেকটি বিষয়ে অভিজ্ঞ না। প্রকৃতপক্ষে এটি এমন একটি বিষয় যা সাধারণ কান্ডজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

আমি এখানে ভারতের কথা জানি না, কিন্তু ইংল্যান্ডে সরকার যখন এমন কোনো খুঁটিনাটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে দৃষ্টিপাত করে যেটি অল্প কিছু লোকেরা বুঝতে সক্ষম, তখন তারা সেটির ব্যাপারে সমস্ত জনগণের সাথে পরামর্শ করে না। বরং তারা ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে একসাথে জড়ো করে যারা সেই ব্যাপারে জ্ঞানী, এবং এরপর সেই ব্যাপারে তাদেরকে প্রশ্ন করে। তারপর তারা বলে যে, আমরা বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করেছি এবং বিশেষজ্ঞরা আমাদের এই পরামর্শ দিয়েছে এবং এখন এটাই আমাদের নীতি। এটা যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি।

সুতরাং আমাদের এরকম পারস্পরিক পরামর্শের ব্যবস্থা আছে যেটি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখিয়ে গেছেন। এবং তা সমাজের সকল স্তরে প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই পদ্ধতিতেই মুসলমানদের নিজেদের কাজ পরিচলনা করা উচিত; ন্যায়বিচার, বোঝাপড়া এবং সহমর্মিতার সাথে। আমরা নিজেদের জন্য যে বিষয়টিকে ভালোবাসি আমাদের ভাইদের জন্যও আমাদের সেই বিষয়গুলোই নির্ধারণ করা উচিত। এই সবকিছুর মানে হলো আমাদের পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ, আলোচনা ও জ্ঞানের আদান প্রদান করা প্রয়োজন।

কিন্তু আমি এটাকে গণতন্ত্র বলতে চাই না, আমি এটাকে বলতে চাই "ইসলাম"। কি জন্য আমাদের বলা দরকার যে, ইসলাম হচ্ছে গণতান্ত্রিক? কি কারণে?

কারণ আমরা এমনই এক সময়ে বাস করছি যখন আমরা মনে করছি যে, আমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করা প্রয়োজন যাতে এই কর্তৃত্বশীল সংস্কৃতি ও দর্শন এর সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারি যেটি এই মুহূর্তে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করছে বলে অনুভূত হয়।

কিন্তু আমি মনে করি না যে, আমাদের এমন করার কোনো প্রয়োজন আছে। প্রকৃতপক্ষে আমি এটা মোটেই পছন্দ করি না। আমি এটা একদমই পছন্দ করি না। আর আমি প্রায়ই এভাবে উদাহরণ দেই। আমি যা বলতে যাচ্ছি তা আপনাদের আঘাত করতে পারে, কিন্তু আমি আশা করি আপনারা এ ব্যাপারে চিন্তা করবেন।

কল্পনা করুন আমরা এমন এক সমাজে বাস করি যেখানে পতিতাবৃত্তি হলো নারী ও পুরুষের মাঝে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের একটি সাধারণ উপায়।

কল্পনা করুন পতিতাবৃত্তি এতই সাধারণ যে, এটা একটা আদর্শ প্রথা, আরও কল্পনা করুন আপনি যখন পতিতাদের দেখেন তখন তাদের অত্যন্ত সুখী মনে হয় এবং মনে হয় যে, তারা এক রকম

সমৃদ্ধশালী জীবন উপভোগ করছে; আরও মনে হয় যে, তাদের তৈরি সমাজটি তো সত্যিই অনেক সমৃদ্ধশালী; তারা চমৎকার সব যন্ত্রপাতি তৈরি করছে এবং তাদের রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি।

আর এভাবে আপনি ভেবে বসলেন যে, যেহেতু তাদের এইসব যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি রয়েছে, তাই সেই সাথে তাদের পতিতাবৃত্তিও অবশ্যই একটা ভালো ব্যবস্থাই হবে।

এভাবে আপনি মনে করলেন, এই যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, পতিতাবৃত্তি – সব মিলিয়ে এটা একটা পরিপূর্ণ প্যাকেজ। ফলে কিছু দুর্ভাগা মুসলমান এগিয়ে এসে বলে বসলো, "জানেন নাকি! ইসলামেও পতিতাবৃত্তি আছে। হ্যাঁ, সত্যিই আছে। আর সেটাকে বলা হয় নিকাহ (বিয়ে)। দেখেন! যেভাবে আপনারা পতিতাদের কাছে যান এবং তাকে টাকা দেন, একইভাবে আমরা আমাদের স্ত্রীদের কাছে যাই এবং দেনমোহর দেই। এটা তো পতিতাবৃত্তির মতোই!"

আস্তাগফিরুল্লাহ। কিভাবে আপনি এটিকে তুলনা করতে পারেন জীবন পরিচালনার সেই সুন্দর ব্যবস্থার সাথে যেটিকে আল্লাহ নাযিল করেছেন? তাই একইভাবে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই যখন দেখি মুসলমানেরা বলা শুরু করেছে যে, ইসলামে গণতন্ত্র আছে। কারণ আমার কাছে এই কথাটিকে এরকম লাগে যেন "ইসলামে কুফর আছে।" যেন কথাটা অনেকটা এরকমই শোনায় যে, "বিয়ে তো পতিতাবৃত্তির মতোই।"

অবশ্যই না!! গণতন্ত্র এর দর্শনভিত্তিক সংজ্ঞা অনুযায়ী তা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। এবং যেই একমাত্র কারণে আমাদের মনে হয় যে, আমাদের এরূপ বলা উচিত, তা হলো, জ্ঞানগতভাবে, দার্শনিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতির কর্তৃত্বশীল প্রভাব।

আর এটা আমাদের জন্য খুবই কঠিন সতর্কবাণী। কেন আমরা কেবল মনে করি যে, আমাদেরকে খাপ খাইয়ে চলতে হবে এবং আপোস করতে হবে? আর এই ধরনের কথা ইদানিং অনেক শুনা যাচ্ছে। এটা এমন কিছু যা ইদানিং অনেক শুনা যায়। যেমন: "মুসলমানদের একবিংশ শতাব্দীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।" "ইসলামকে এগিয়ে নিতে হবে ও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।" "আমাদেরকে তাদেরটা গ্রহণ করতে হবে ও নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে।"

সম্প্রতি আমি একটা প্রবন্ধে এরকম পড়েছি: "যদি আমরা দাবি করি যে, ইসলাম হচ্ছে সকল সময় ও সকল স্থানের জন্য আদর্শ জীবন পদ্ধতি, তাহলে ইসলামকে সকল সময় ও সকল স্থানের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে।"

এ হলো আরেক পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। সে এমন এক যুক্তি নিয়ে এলো যা শুধু ইসলামের ধ্বংসের দিকেই ধাবিত করে। এমন কথা কখনোই আমাদের দাবি হতে পারে না।

আমরা দাবি করি যে, আল্লাহ চান যেন আমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করি এবং আমাদের সর্বোচ্চ সাধ্য অনুযায়ী তাঁর দ্বীনকে অনুসরণ করি সকল স্থানে ও সকল সময়ে।

এর মানে এই নয় যে, ইসলামকে যুগোপযোগী হবার জন্য পরিবর্তিত হতে হবে। এর মানে মোটেও তা নয়। যদি আধুনিক সমাজ আমাদের দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে আমি বলবো, সেই আধুনিক সমাজকে পরিত্যাগ করুন! পরিত্যাগ করুন!

আমাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করতে হবে। আমি কতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো? আমি খুব অল্প সময়ের জন্যই এ দুনিয়াতে এসেছি।

আমি এরকম বলি না এবং এখনোও বলছি না যে, ইসলাম ও বর্তমান সমাজ সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। আধুনিক সমাজে অনেক কিছু আছে যেগুলো ইসলামের সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ। আর আধুনিক সমাজে এমন অনেক কিছুই আছে যেগুলো মূলতঃ ইসলাম থেকেই এসেছে।

মজার বিষয় হলো পশ্চিমা বিশ্বের অনেক ভালো দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে যখন আমরা ইতিহাসের দিকে তাকাই, আমরা দেখতে পাবো এই গুণগুলো পূর্বেই মুসলমানদের সমাজে বিদ্যমান ছিল। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমারা এই গুণগুলো আমাদের থেকে নিয়েছিল, তারা এগুলো বাস্তবায়ন করেছে এবং আমরা এগুলো ছেড়ে দিয়েছি।

আমরা অনেক উদাহরণ দেখতে পাই। আপনি যদি বিভিন্ন লেখনী পড়েন, উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি ইসলামের প্রতি পর্যবেক্ষণকারী পশ্চিমাদের লেখনী পড়েন, তারা এসব লিখেছিল দেড়শ বছর আগে, তারা প্রশংসা করেছিল যে, কিভাবে ইসলাম সাম্প্রদায়িকতাকে বাতিল করেছিল, কিভাবে ইসলাম ধর্ম সকল সম্প্রদায় অথবা লোকদেরকে একই কাতারে এনেছিল।

আর এখন আমরা দেখছি, কে সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটনে নেতৃত্ব দিচ্ছে ও অগ্রসর হচ্ছে? আমেরিকা, ব্রিটেন - এইসব দেশসমূহ। তাদের নিজ দেশে তারা সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণে অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছে।

এই সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণ বিষয়টি তারা উদ্ভাবন করে নি। আমাদের ধর্মে এটা শত শত বছর ধরেই আছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এটি এমন জিনিস যেটি মুসলমানদের ছিল এবং আমরা তা হারিয়ে ফেলেছি। এরকম অনেক কিছুই আমাদের ছিল যদি আপনি আমাদের দ্বীনের প্রতি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন।

যেমন ইসলামে আপনার পটভূমি কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়, আপনি হতে পারেন ময়লা পরিষ্কারকারীর ছেলে অথবা কৃষক। অথবা আপনি হতে পারেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, একজন ডাক্তার, কিংবা একজন ইঞ্জিনিয়ার,.....

আপনি যদি ইতিহাসের দিকে তাকান এবং অনুসন্ধান করেন যে, এই ধারণাটি কোথা থেকে এসেছে, যদি আমরা পশ্চিমাদের দিকে তাকাই, আমরা দেখতে পাবো যে, পশ্চিমাদের ছিল এমন এক অভিশপ্ত ব্যবস্থা, যা ছিল “ফিউডাল” ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থা অনুসারে আপনি যদি একজন পেজেন্ট হয়ে জন্মগ্রহণ করেন - যাকে বলা হতো সার্ফ (দাস বা গোলাম), তবে আপনি হয়ে যাবেন জমিদারের গোলাম বা দাস। আপনি একজন গোলাম

বা দাস, যেহেতু গোলাম হয়ে জন্মেছেন এবং এভাবে আপনার বংশ চলতেই থাকবে। এভাবে যে বণিক তার পরবর্তীরাও সেই বণিক। আপনি যোদ্ধা তো এর পর আপনার পরিবার সেটাই ধারণ করলো। আপনি অভিজাত হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন, আপনার পরিবারে তা থেকে যাবে।

এভাবে সবকিছু শক্ত করে রূপ দেয়া হয়েছিল। একজন দাস কখনো একজন যোদ্ধা হতে পারতো না। কক্ষনো না। একইভাবে একজন যোদ্ধাও কখনো বণিক হতে পারতো না।

পৃথিবীতে কোন সমাজ ব্যবস্থা এরকম বিভেদকে স্বীকৃতি দেয় নি? কারা মানুষ ও পেশার মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছে? ইসলাম। এটা ইসলাম থেকে এসেছে।

কোন সমাজব্যবস্থায় ন্যায়বিচার বিদ্যমান ছিল যেখানে আপনি সমাজের কোন শ্রেণী থেকে এসেছেন সেটি কোনো ভূমিকা রাখে না? আপনি একজন নেতা হতে পারেন, আপনি একজন উচ্চবংশীয় হতে পারেন, আপনি সমাজের যেকোনো অংশ থেকে হতে পারেন। কিন্তু কাজী বা বিচারক আপনাকে তার সামনে আনতে পারতো এবং আপনার বিচার করতে পারতো, এবং এটা অস্বাভাবিক ছিল না।

এটাই হলো ইসলাম। সাহাবীদের (রাঃ) জীবনী থেকে আমরা এরকম অনেক বিখ্যাত কাহিনী, অনেক বিখ্যাত ঘটনা পাই। আসলে আমরা অনুসন্ধান করলে মুসলমানদের ন্যায়বিচারের অনেক সত্য ঘটনা খুঁজে পাবো। এটা কোনো বিষয় ছিল না যে, আপনি কে অথবা সমাজের কোন অংশ থেকে উঠে এসেছেন। আপনারা সবাই একই আইনের অধীনস্থ।

এটি এমন একটি ধারণা যেটি আজ পশ্চিমাদের মাঝে দেখা যায়। এবং আমার মনে আছে আমার একজন বন্ধুর কথা, সে কিছুদিন আগে আমাকে ফোন করেছিল। এবং ডিক চেনি, সে আমেরিকার অন্যতম একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, হতে পারে সে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত না। আপনারা হয়তো জানেন যে, সম্প্রতি তাকে দুর্নীতির অভিযোগে কোর্টে নেওয়া হয়েছে। তো আমার বন্ধু আমাকে ফোন করেছিল এবং বলেছিল, "খবর দেখেছো নাকি? এই আমেরিকানদের অবস্থা দেখেছো? দুর্নীতির অভিযোগে ডিক চেনিকে কোর্টে নেওয়া হয়েছে!"

আমার এই বন্ধুটি দুবাই থাকে। আমি বলেছিলাম, "হ্যাঁ। এটা কি বিস্ময়কর!... না?!"

"ভাই, তোমরা কি দুবাইতে এরকম কিছু চিন্তা করতে পারো? যেখানে তোমাদের একজন প্রিন্স অথবা কোনো একজন নেতা একটি দুর্নীতি করেছে এবং তাকে এভাবে কোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে?"

এরপর সে লজ্জা পেলো... এরপর সে লজ্জা পেলো এবং আর কিছু বললো না...

ভাই ও বোনেরা, যদি আপনারা সত্যিই জানতে ও বুঝতে চান যে কেন আল্লাহ এই লোকদেরকে জমিনে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং আমাদের থেকে ক্ষমতা চলে গেছে, তাহলে, এর কারণ হচ্ছে তারা এই সকল ন্যায়বিচারের মূলনীতির অনুসরণ করে (যা আমাদের ইসলামে পূর্বেই ছিল)।

তাদের অনেক খারাপ গুণ থাকলেও এটির (ন্যায়বিচার) প্রচলন আছে – যদিও আমার মনে হয় এটার পরিবর্তন হচ্ছে – কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের ধারণাটির প্রচলন আছে। এবং সবার জন্য ন্যায়বিচার।

কিন্তু আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। মুসলমানদের দেখুন, আমাদের ভূমিগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন, দেখুন কিভাবে আমরা একে অপরের সাথে আচরণ করছি। আমরা এমনকি একে অপরের ব্যাপারে কথা বলতে জানি না, এমনকি আমরা জানি না কিভাবে একে অপরের গঠনমূলক সমালোচনা করতে হয়।

আমরা দেখি যে, অমুক দলের অমুক তমুক দলের তমুকের সমালোচনা করছে! অথচ তার নিজের দল বা সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি যদি এর চেয়েও জঘন্য কিছু করে, সে তার সমালোচনা করে না! শুধুমাত্র অন্য দলের হওয়ায় সে তার সমালোচনা করছে: "এহ! দেখেছো ওকে, সে এটা করছে এবং ওটা করছে।" কিন্তু নিজের দলের লোক হলে সে তার ব্যাপারে অন্ধ হয়ে থাকে। এটা কি ন্যায়বিচার? এটা কি ন্যায়বিচার??

এমনকি সে ঐ দলের লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলবে অথবা তার উপর অপবাদ দিবে অথবা ঐ লোকের ব্যাপারে মিথ্যা কাহিনী রচনা করবে। এটা কি ন্যায়বিচার? আমরা এমনকি নিজেদের মাঝেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারি না!

এবং এগুলো হলো তথাকথিত ইসলামী দলের অবস্থা। তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি?

আর আমরা আমাদের এই অবস্থা দেখে বিস্মিত হই! আর এরপর যদি আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ন্যায়বিচারকে গণতন্ত্রের অর্থ বানাই তাহলে চলবে না; কারণ এটা গণতন্ত্র না। এটা ইসলাম। আমাদের দ্বীন এটা আমাদেরকে শিখিয়েছে চৌদ্দশ বছর পূর্বে। এই বিষয়গুলো আমাদের উত্তরাধিকার, যা আমাদের দাবি করতে হবে।

এবং যদি আমরা কাফেরদের দেখে উপকৃত হই এবং লক্ষ্য করি তারা কি করছে এবং কিভাবে করছে, এবং আমরা মনে করি সেগুলোর থেকে আমরা উপকৃত হতে পারবো – তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। এতে কোনো সমস্যা নেই!

কিন্তু আমাদের কখনোই মনে করা উচিত না যে, এজন্য আমাদেরকে আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় দিতে হবে! আমাদের কখনোই মনে করা উচিত না যে, আমদের দ্বীন পরিত্যাগ করতে হবে। আমরা কখনোও এমন চিন্তা করবো না যে, নিছক কোনো অ-ইসলামী ভাবাদর্শের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য আমাদেরকে আমাদের সমগ্র দ্বীনকে পরিবর্তন করতে হবে!

আমি আপনাদেরকে এই সত্যটাই বলতে চাই, আমার ভাই ও বোনেরা! আমি আপনাদের কাছে প্রকৃত সত্যটা বলতে চাই, যা হচ্ছে: গণতন্ত্রের পতন ঘটছে! অনেক দেশে আপনি দেখতে পাবেন যে, গণতন্ত্র ব্যর্থ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ধীরে ধীরে গণতন্ত্র ছেড়ে দিচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস হলো গণতন্ত্র বলে কোনো কিছু আসলে নেই, এমনকি এর কোনো অস্তিত্বই নেই! পশ্চিমে যেটা আছে, আমার মতে সেটা হলো, গণতন্ত্রের নামে একটি বিভ্রম। এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের নামে ধোঁকা।

তারা জনগণকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, তাদের একটা মতামত বা বাছাই করবার অধিকার আছে, তারা চাইলে বিভিন্ন বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারে; কিন্তু আসলে তারা কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না। এক্ষেত্রে, পৃথিবীর মূল ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর লোকদের হাতেই থেকে যায়।

তারা হলো বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ, তারা হলো বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহ, তারা হলো কিছু অভিজাত লোক যাদের হাতে ক্ষমতা ও অর্থ আছে, এবং তারা যেরূপ মূলনীতি চায় সেরূপ মূলনীতি অনুসারেই পৃথিবী চলে।

আপনার গার্লফ্রেন্ড অথবা বয়ফ্রেন্ড আছে নাকি নেই, আপনি সমকামী নাকি না, অথবা আপনি মাদকদ্রব্য সেবন করেন নাকি করেন না – এই সব দিয়ে তাদের কিছুই আসে যায় না।

প্রকৃতপক্ষে তারা এটাই চায়। কারণ আপনি যতই এসব পাপাচারে লিপ্ত হবেন, আপনার জীবন ততই দুঃসহ হয়ে উঠবে। আর আপনার জীবন যতই দুঃসহ হবে, ততই আপনার জীবনকে তৃপ্ত করার জন্য লাগবে ফ্যাশন, ছায়াছবি, পানীয়, সংগীত, এবং সকল ভোগ্য বস্তুসমূহ।

তারা আপনাকে দেখাতে চায় যে, জীবনকে তৃপ্ত করার জন্য এটা লাগবে, ওটা লাগবে, এটা নাও, ওটা নাও। দুর্দশাগ্রস্ত লোকেরাই ভোগে লিপ্ত হয়। সুতরাং এরূপ সমাজ তৈরি করে তাদের অনেক লাভ। তাই তারা সমাজটাকে সেভাবেই গড়তে চায়!

তাই আমি আসলে নিশ্চিত নই যে, তথাকথিত গণতন্ত্রের মাঝে আদৌ কোনো গণতন্ত্র আছে কিনা! যে জিনিসটা আমাকে এটা বুঝিয়েছে সেটা হলো,

সম্প্রতি ইংল্যান্ডে... শুধু ইংল্যান্ড না, বরং ইতালী এবং পুরো ইউরোপ জুড়ে ইরাকে যুদ্ধের বিপক্ষে ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছিল; ইংল্যান্ডে এই যুদ্ধের বিপক্ষে পঁচিশ লক্ষ লোক জড়ো হয়েছিল।

ইতালীতে সংখ্যাটি ছিল পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষ, এটা ছিল ইউরোপের ইতিহাসে আমাদের জানামতে সবচেয়ে বড় জনসমাবেশ।

জরিপে প্রমাণিত হয়েছিল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণই এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে রয়েছে। কিন্তু তবুও তারা এগিয়ে গিয়েছিল এবং যুদ্ধ করেছিল। কোথায় গেলো সেই নীতি: "জনগণের থেকে, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা?" কোথায় গেলো সেই নীতি যে, জনগণই ঠিক করবে আমরা কি করবো এবং কি করবো না?

আর এভাবেই আমরা অনেক দেশে এই ঘটনা দেখতে পাই। আমরা অনেক দেশে এই ঘটনা দেখতে পাই!

আমি ভারতীয় রাজনীতির ব্যাপারে খুব বেশী জানি না, কিন্তু আমার ধারণা খুব অল্প সংখ্যক লোকেরাই ঠিক করে যে, আসলে এই দেশে কি হবে।

স্বয়ং আমেরিকায় জর্জ বুশও এমনকি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ছিল না। বরং সে সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিল! আসলে সে নির্বাচনে পরাজয়ের মুখে ছিল। এবং তারা গণনা বন্ধ করে দেয়! ফ্লোরিডায় যা ঘটেছিল সেই বিখ্যাত ঘটনা কি সবার জানা নেই? আর প্রকৃতপক্ষে, তারা জর্জ বুশকে জেতানোর জন্য কারচুপি করেছিল! এটা কি ধরনের গণতন্ত্র?

সুতরাং আমরা সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটিই সত্য পাই, “গণতন্ত্র হলো ভন্ডতন্ত্র।”

আর বাস্তবতা হলো, যখন আমরা এইসব তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর অধিকাংশের দিকে তাকাই, আমরা কি দেখতে পাই? ঠিক এই ভন্ডামীই নজরে পড়ে।

আমি সেই দিনের আশায় আছি যেদিন মুসলমানেরা দুঃখ প্রকাশ ও কৈফিয়ত দেয়া ছেড়ে দিবে, এবং কৈফিয়তমূলক হওয়া ছেড়ে দিবে। কারণ তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের কাছে সবচেয়ে সুন্দর দ্বীন আছে যার কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, যার কোনো খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই।

আমাদের কেবল যা লাগবে তা হলো, ইসলামের সত্যিকার আদর্শকে আঁকড়ে ধরা যেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করে দেখিয়ে গেছেন। এবং এভাবেই আবারও, আমার ভাই ও বোনেরা, আমরা হতে পারবো মানবজাতির জন্য একটি প্রজ্জ্বলিত আলোকবর্তিকা এবং অনুসরণীয় দিকনির্দেশিকা।

কিন্তু এটা কেবল তখনই হবে যখন আপনি আপনার জীবন পরিবর্তন করবেন। যখন আপনি এবং আমি, ভাই ও বোনেরা, যখন আমরা আল্লাহর আইনকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করবো, আল্লাহর শরীয়তকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করবো, যখন আমরা আল্লাহকে মেনে চলবো, যখন আমাদের দ্বারা প্রদর্শিত হবে উত্তম গুণাবলী – ভদ্রতা, দয়া, ভালোবাসা, সমবেদনা ও ন্যায়বিচার, এবং অবশ্যই সেই সাথে আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় আনুগত্য,

তখন আমরা দেখবো যে, যখন আমাদের হৃদয়ে থাকবে ইসলামী রাষ্ট্র, তখন আল্লাহ জমিনে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে দিবেন।

আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুণ নবীজি, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি।

\- - - - - - - - - - - - - - - - -

(১) সূরা নিসা, আয়াত: ১১৫

(২) আহমদ (৪/১২৬), ইবনে মাজাহ (৪৩), হাকিম (১/৯৬)

মন্তব্য: একটি বাস্তবতা হচ্ছে, গায়ের রঙ অনেক কালো, মাথা ছোট আকৃতির এবং উপরন্তু পরিচয় হলো দাস – এমন ব্যক্তিকে সাধারণত কেউই শ্রদ্ধা করতে চায় না। আর এই হাদীসটি এখানে এমনই একজন ব্যক্তির (আবিসিনিয়ান দাস) বর্ণনা করেছে এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করার জন্য যে, ইসলামী শরীয়ত অনুসারে আইনসম্মত একজন শাসকের আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক, এক্ষেত্রে ভৌগলিক, উপজাতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সাম্প্রদায়িকতা বিবেচনার বিষয় হবে না।

(৩) সুনানে আবু দাউদ (৪৬০৭), তিরমিযী (২৬৭৬)

(৪) সূরা নিসা, আয়াত: ১১৬

(৫) সূরা তাওবা, আয়াত: ৩১

(৬) এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে জারীর (রহিমাহুমুল্লাহ)। বিস্তারিত জানতে দেখুন তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা তাওবা এর ৩১ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা।

(৭) সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৪

(৮) সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৭

(৯) সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৫